

দশম অধ্যায়
উদ্ভিদ প্রজনন

PLANT REPRODUCTION

প্রধান শব্দসমূহ :
প্রজনন, নিষেক,
পার্শ্বনোজেনেসিস,
সংকরায়ন।

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা জীবের প্রজনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করেছো, বিশেষ করে পুষ্পক উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ, ফুলের গঠন, পরাগায়ন, গ্যামিট সৃষ্টি, নিষেক এবং ফল ও বীজ উৎপাদন বিষয়ে জেনেছো। এ অধ্যায়ে বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠশেষে শিক্ষার্থীরা—

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পাড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া।	পাঠ ১	যৌন প্রজনন
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা।	পাঠ ২	অযৌন প্রজনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের ধারণা।	পাঠ ৩	উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গ জনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন।	পাঠ ৪	উদ্ভিদ সংকরায়ন
❖ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব।		

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। প্রতিটি জীবেরই তার অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে। কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল চারা, আমের বীজ থেকে আম চারা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পরিপূর্ণ কাঁঠাল গাছ ও আম গাছে পরিণত হয়। একই ভাবে কলা গাছের গোড়া থেকে কলার চারা (সাকার), বাঁশ গাছের গোড়া থেকে বাঁশের চারা (সাকার) যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ কলা গাছ ও বাঁশ গাছে পরিণত হয়। শিমুল, সজিনা, মাদার, জীয়েল ইত্যাদি গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগালে সেই ডাল সজীব হয়ে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয়। পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে তার কিনার থেকে নতুন পাথরকুচি চারা সৃষ্টি হয়। মাতৃ উদ্ভিদ থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া। যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে সেই প্রক্রিয়াকে প্রজনন বলা হয়। এ অধ্যায়ে উদ্ভিদের প্রজনন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জন সৃষ্টি, তার বিকাশ ও প্রকাশই উদ্ভিদের যৌন প্রজননের মূল উদ্দেশ্য। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের জন সৃষ্টি ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই **উদ্ভিদ জনবিজ্ঞান বা Plant Embryology**। Embryo-এর বাংলা হলো জন।

প্রজননের প্রকারভেদ : উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। যৌন প্রজনন এবং ২। অযৌন প্রজনন। এছাড়া কোনো কোনো উদ্ভিদে অন্য এক ধরনের প্রজনন দেখা যায় যা পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি নামে পরিচিত।

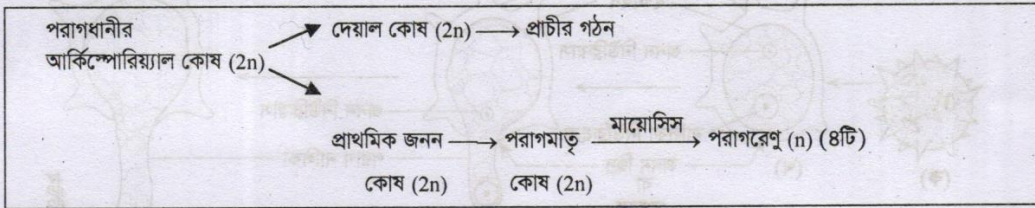
আবৃতবীজী উদ্ভিদে যৌন প্রজনন (Sexual Reproduction of Angiosperm)

আবৃতবীজী উদ্ভিদে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় ডিম্বকে, ডিম্বক সৃষ্টি হয় ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয়ে। শুক্রাণু সৃষ্টি হয় পরাগরেণুতে, পরাগরেণু সৃষ্টি হয় ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে। কাজেই ফুলই আবৃতবীজী উদ্ভিদে জননঙ্গ ধারণ করে। ফুল হলো উদ্ভিদের বংশবিস্তারের (প্রজননের) জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপ (shoot)।

১। যৌন প্রজনন (Sexual reproduction) : দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির গ্যামিটের (পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট) মিলনের মাধ্যমে যে প্রজনন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তাই যৌন প্রজনন। যৌন প্রজননের মাধ্যমে সবীজী উদ্ভিদে বীজের সৃষ্টি হয়, তাই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় যৌন প্রজনন। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্যামাস ধরনের।

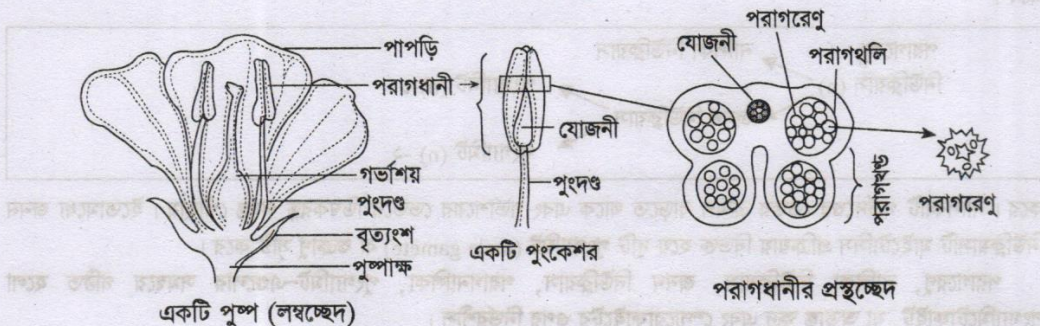
রেণুস্থলী বা পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of Microsporangia) : ফুলের তৃতীয় স্তবক হলো পুংজনন স্তবক। এক বা একাধিক পুংকেশর নিয়ে এ স্তবক গঠিত। প্রতিটি পুংকেশর নিচে দণ্ডাকার পুংদণ্ড (filament) এবং মাথায় ক্ষীত পরাগধানী (anther) নিয়ে গঠিত। পরাগধানীর দুটি খণ্ডের মাঝখানে একটি যোজনী (connective) থাকে।

পরিণত পরাগধানী (anther) অনেকটা চারকোণাবিশিষ্ট হয়। প্রতি কোণে ভেতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড়ো হয়। এদের ঘন সাইটোপ্লাজম এবং বড়ো নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (archesporial cell) বলা হয়। এ কোষ প্রজাতিভেদে সংখ্যায় এক থেকে একাধিক থাকতে পারে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে দেয়ালকোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষে (primary sporogenous cell) পরিণত হয়। দেয়ালকোষ হতে পরে ৩-৫ স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর গঠিত হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ঘেরা এ অংশকে পরাগথলি (pollen sac) বলে। প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর হলো ট্যাপেটাম। JU 22-23



প্রাথমিক জননকোষ পরাগমাতৃকোষ হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো পরাগমাতৃকোষে পরিণত হতে পারে। পরাগমাতৃকোষে তখন মায়োসিস (meiosis) বিভাজন হয়, ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগমাতৃকোষ হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। পরাগরেণু বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত হলুদ বর্ণের হয়। ট্যাপেটাম (tapetum) বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে। পরাগমাতৃকোষ হতে সৃষ্ট চারটি পরাগরেণু বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে। চারটি পরাগরেণু একসাথে হালকাভাবে লাগানো অবস্থায় থাকে যাকে পরাগ চতুষ্টয় বা পোলেন টেট্রাদ (Pollen tetrad) বলে। তবে পরিণত অবস্থায় পরাগরেণুগুলো পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে। একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর এ বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম (pollinium) বলে। RU 21-22

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার ও ত্রিভুজাকার হয় এবং এদের ব্যাস ১০ থেকে ২০০ μm পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি তুক থাকে। বাইরের তুকটি কিউটিনযুক্ত, পুরু ও শক্ত। এটি বহিঃতুক বা এক্সাইন (exine) নামে পরিচিত। এক্সাইন বিভিন্নভাবে অর্নামেন্টেড থাকে। এক্সাইন-এ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থাকে, প্রধান উপাদান হলো স্পোরোপোলেনিন। ভেতরের তুকটি



চিত্র ১০.১ : একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ), একটি পুংকেশর, পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ এবং একটি পরাগরেণু।

বেশ পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এর নাম অন্তঃতুক বা ইন্টাইন (intine)। এক্সাইন (বহিঃতুক) ছানে ছানে অত্যন্ত পাতলা থাকে, পাতলা ছিদের ন্যায় অংশকে জনন ছিদ্র, রেণুরন্ধ বা জার্মপোর (germpore) বলে। (চিত্র-১০.২)। একটি

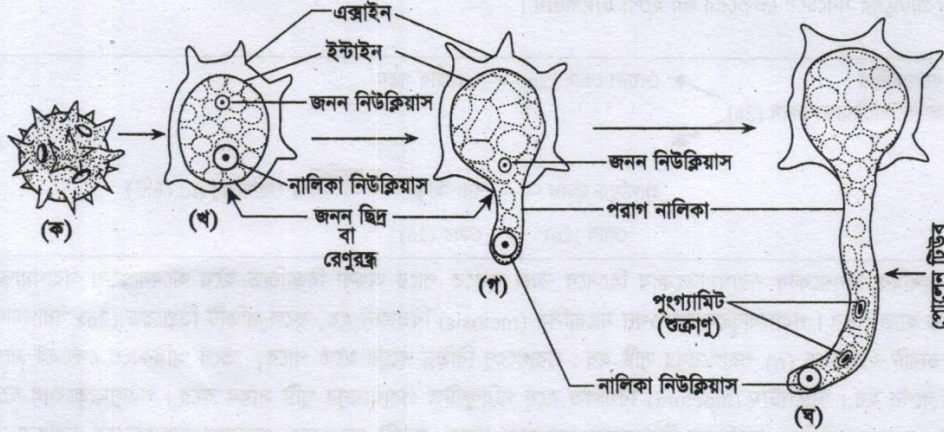
৩৫৬

জীববিজ্ঞান-প্রথম পত্র

পরাগরেণুতে সাধারণত একাধিক জার্মপোর (২০টি পর্যন্ত) থাকে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে এবং প্রথমে নিউক্লিয়াসটি মাঝখানে থাকে। পরিণত অবস্থায় কোষগহ্বর সৃষ্টির ফলে নিউক্লিয়াসটি এক দিকে সরে আসে।

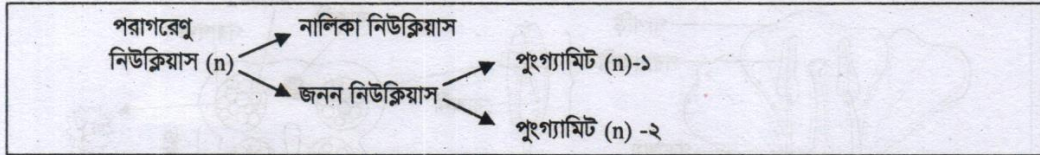
পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte) ও গঠন : পরাগরেণু(n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। বড়োটিকে

RU 20-21



চিত্র ১০.২: (ক) পরাগরেণু, (খ-গ) পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ এবং (ঘ) পুংগ্যামিটোফাইট।

বলা হয় নালিকা নিউক্লিয়াস (tube nucleus) এবং ছোটটিকে বলা হয় জনন নিউক্লিয়াস (generative nucleus)। পরাগধানীর প্রাচীর ফেটে গেলে সাধারণত এ দুই নিউক্লিয়াস অবস্থায় পরাগরেণু বের হয়ে আসে এবং পরাগায়ন (Pollination) সংঘটিত হয়। পরাগরেণুর পরবর্তী ধাপসমূহ পরাগ নালিকার মধ্যে ঘটে থাকে। উদ্ভিদে পরাগায়নের কারণে কোনো তরল পদার্থ (পানি) ছাড়াই নিষিক্তকরণ (fertilization) সম্ভব হয়। পরাগায়নের মাধ্যমে পরাগরেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ ইন্টাইন বৃদ্ধি পেয়ে জার্মপোর (জননছিদ্র) দিয়ে নালিকার আকারে বাড়তে থাকে। এ নালিকাকে পোলেন টিউব (pollen tube) বা পরাগনালিকা বলে। পরাগনালিকার ভেতরে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে।

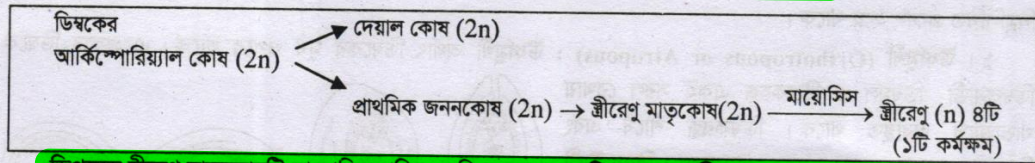


করে। নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভেতর ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকরন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ইতোমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি পুংগ্যামিট (male gamete) বা স্ত্রীকেশ্র সৃষ্টি করে।

পরাগরেণু, নালিকা নিউক্লিয়াস, জনন নিউক্লিয়াস, পরাগনালিকা, পুংগ্যামিট-এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হলো পুংগ্যামিটোফাইট, যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্পোরোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।

ডিম্বকের পরিস্ফুটন (Development of ovule) : ডিম্বক হলো ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থ একটি অংশ যা মাতৃজননকোষ সৃষ্টি করে এবং নিষেকের পর বীজে পরিণত হয়। ডিম্বক (ovule) সৃষ্টি হয় গর্ভাশয়ের ভেতরে অমরা (placenta) হতে। প্রথমে অমরাতো একটি ছোটো স্ফীত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্ফীত অঞ্চলটি ক্রমে ডিম্বকে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে

ডিম্বকের টিস্যুকে মূলত দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়- চারপাশের আবরণ টিস্যু এবং মাঝের নিউসেলাস (nucellus) টিস্যু।
পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের আবরণটির নিচে আর একটি আবরণ তৈরি হয়। বাইরের আবরণটি বহিঃত্বক এবং ভেতরেরটি
অন্তঃত্বক হিসেবে পরিচিত। ডিম্বকের অগ্রভাগে নিউসেলাসের একটি অংশ অনাবৃত থাকে, কারণ ত্বক এ অংশকে আবৃত করে
না। এটি একটি ছিদ্রপথ বিশেষ, যাকে মাইক্রোপাইল (micropyle) বা ডিম্বকরঞ্জ বলা হয়। ডিম্বকরঞ্জের কাছাকাছি
নিউসেলাস টিস্যুতে একটি কোষ আকারে বড়ো হয়। এর নিউক্লিয়াসটিও আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ো থাকে এবং কোষটি ঘন
সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এ কোষকে প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (primary archesporial cell) বলে।
আর্কিস্পোরিয়াল কোষটি বিভক্ত হয়ে একটি দেয়ালকোষ এবং একটি প্রাথমিক জননকোষ (primary sporogenous cell)
সৃষ্টি করতে পারে অথবা সরাসরি জীরেণু মাতৃকোষ (megaspore mother cell) হিসেবে কাজ করে।



ডিপ্লয়েড জীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড জীরেণু (megaspore) তৈরি করে। চারটি জীরেণুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং একটি (নিচেরটি) কার্যকর হয়।

ডিম্বকের গঠন : একটি ডিম্বক (megasporangium = ovule) নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত:

১। ডিম্বকনাড়ী (Funiculus) : ডিম্বকের বোঁটার ন্যায় অংশকে ডিম্বকনাড়ী বলা হয়। এ বোঁটার সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকত্বকের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত থেকে শিরার মতো গঠন করে। এ যুক্ত অংশকে র্যাপি (raphe) বলে।

২। ডিম্বকনাড়ী (Hilum) : ডিম্বকের যে অংশের সাথে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাড়ী বলে।

৩। নিউসেলাস (Nucellus) বা জগপোষক টিস্যু: ত্বক দিয়ে ঘেরা প্রধান টিস্যুই হলো নিউসেলাস।

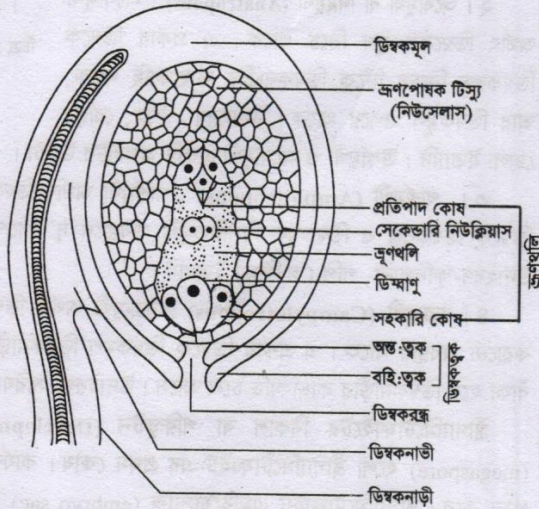
৪। ডিম্বকত্বক (Integument) : নিউসেলাসের বাইরের আবরণীকেই ডিম্বকত্বক বলা হয়। সাধারণত এটি দুস্তরবিশিষ্ট।

৫। ডিম্বকরঞ্জ (Micropyle) : ডিম্বকের অগ্রভাগে ত্বকের ছিদ্র অংশই ডিম্বকরঞ্জ বা মাইক্রোপাইল।

৬। ডিম্বকমূল (Chalaza) : ডিম্বকের গোড়ার অংশ, যেখান থেকে ত্বকের সূচনা হয়, তাকে ডিম্বকমূল বলে।

৭। জগথলি (Embryo sac) : নিউসেলাসের মধ্যে অবস্থিত থলির ন্যায় অংশকে জগথলি বলে।

জগথলি নিম্নবর্ণিত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।



চিত্র ১০.৩ : ডিম্বকের গঠন (নিম্নমুখী বা অধোমুখী ডিম্বকের লম্বেদ)।

RU 21-22

RU 19-20

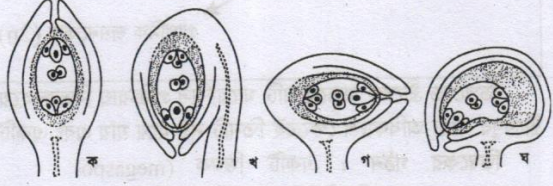
(ক) গর্ভযন্ত্র (Egg-apparatus) : ডিম্বকরঞ্জের সন্নিকটে তিনটি কোষ দিয়ে গঠিত জগণথলির অংশকে গর্ভযন্ত্র বলে। গর্ভযন্ত্রের তিনটি কোষের মধ্যে ভেতরের দিকের সবচেয়ে বড়ো কোষটিকে ডিম্বাণু এবং বাইরের দিকের ছোটো কোষ দুটিকে সহকারী কোষ (Synergid) বলে।

(খ) প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cell) : এরা ডিম্বকমূলের দিকে অবস্থিত জগণথলির তিনটি বিশেষ কোষ।

(গ) সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (Secondary nucleus) : দুমেরু থেকে আগত এবং জগণথলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসকে মেরু নিউক্লিয়াস (Polar nucleus) বলে। নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয়ে যে একটি ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস গঠন করে তার নাম সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস।

বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক : ডিম্বকরঞ্জ, ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বকমূল ইত্যাদি অংশের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বক নিম্নলিখিত প্রকার হয়ে থাকে।

১। উর্ধ্বমুখী (Orthotropous or Atropous) : উর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ ওপরে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বমূল ও ডিম্বকরঞ্জ একই সরল রেখায় খাড়াভাবে অবস্থিত থাকে। ডিম্বকরঞ্জ শীর্ষে এবং ডিম্বকমূল গোড়ায় অবস্থান করে। উদাহরণ : বিষকাটালী (পানি মরিচ), গোলমরিচ, পান ইত্যাদি।



চিত্র ১০.৪ : বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন। (ক) উর্ধ্বমুখী; (খ) অধোমুখী, (গ) পার্শ্বমুখী; (ঘ) বক্রমুখী।

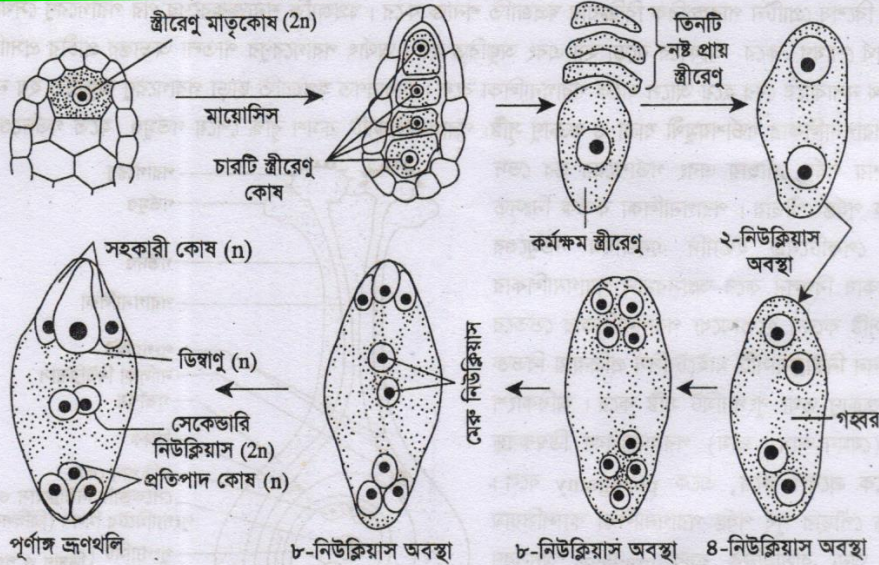
২। অধোমুখী বা নিম্নমুখী (Anatropous) : অধোমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ নিচে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরঞ্জ নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে, আর ডিম্বকমূল ওপরে থাকে। উদাহরণ : শিম, রেড়ি, ছোলা ইত্যাদি। উর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী একটি অপরটির উল্টো।

৩। পার্শ্বমুখী (Amphitropous) : পার্শ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ ওপরে বা নিচে নয়, এক পাশে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরঞ্জ ও ডিম্বকমূল বিপরীতমুখী অবস্থানে দু'পাশে থাকে এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে। উদাহরণ-ক্ষুদিপানা, পপি (আফিম) ইত্যাদি।

৪। বক্রমুখী (Campylotropous) : বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ পার্শ্বমুখীর চেয়ে কিছুটা বেঁকে নিচের দিকে মুখ করানো অবস্থায় থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকমূল ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থিত কিন্তু ডিম্বকরঞ্জ অঞ্চলটি একটু বাঁকা হয়ে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি চলে আসে। উদাহরণ- সরিষা, কালকাসুন্দা।

স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte) ও গঠন : স্ত্রীরেণু (megaspore) হলো স্ত্রীগ্যামিটোফাইট-এর প্রথম কোষ। কার্যকরী স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠন করে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট এমব্রিওস্যাক (embryo sac) বা জগণথলি নামেও পরিচিত। জগণথলির গঠন প্রধানত তিন প্রকার: যথা— (i) মনোস্পোরিক (monosporic)—এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু জগণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; (ii) বাইস্পোরিক (bisporic)—এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু জগণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে, এটি Allium type হিসেবে পরিচিত এবং (iii) টেট্রাস্পোরিক (tetrasporic)—এক্ষেত্রে চারটি স্ত্রীরেণুই জগণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। টেট্রাস্পোরিক ৭ প্রকার হয়, প্রধান Peperomia type যা ১৬-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়। Fritillaria type ৮-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। শতকরা প্রায় ৭৫টি উদ্ভিদেই মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় জগণথলি গঠিত হয়। তাই এখানে জগণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াই বর্ণনা করা হলো। মনোস্পোরিক অধিকাংশই, ৮-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট জগণথলি গঠন করে। ব্যতিক্রম হলো Oenothera type যা ৪-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট। মনোস্পোরিক Polygonum ধরন হিসেবেও পরিচিত। সর্বপ্রথম স্ট্রাসবার্গার ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে Polygonum divaricatum নামক উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় জগণথলি গঠনের বর্ণনা দেন।

স্ট্রীগ্যামিটোফাইট সৃষ্টি : এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড স্ট্রীপেণ্ড মাতৃকোষ হতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ট্রীপেণ্ড গঠিত হয় যার মধ্যে ওপরের তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং নিচেরটি কার্যকরী থাকে। কার্যকরী স্ট্রীপেণ্ড নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস দুটি স্ট্রীপেণ্ড কোষের দু'মেরুতে অবস্থান করে। প্রতিটি মেরুর নিউক্লিয়াস পরপর দু'বার বিভাজিত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস অল্প সাইটোপ্লাজম এবং হালকা প্রাচীর দিয়ে আবৃত থাকে (কাজেই কোষও বলা যেতে পারে)। ইতোমধ্যে স্ট্রীপেণ্ডকোষটি একটি দু'মেরু যুক্ত থলির ন্যায় অঙ্গে পরিণত হয় এবং এর প্রতি মেরুতে ৪টি করে মোট ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে। এ অবস্থায় প্রতি মেরু হতে একটি করে নিউক্লিয়াস থলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়, যাকে ফিউশন নিউক্লিয়াস বা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (fusion nucleus or secondary nucleus) বলা হয়।



চিত্র ১০.৫ : মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ট্রীগ্যামিটোফাইটের বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ বা স্ট্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ।

জগৎথলির যে মেরু ডিম্বকরঞ্জের দিকে থাকে সে মেরুর তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে এগ অ্যাপারেটাস (egg apparatus) বা ডিম্বাণু যন্ত্র বা গর্ভযন্ত্র বলে। ডিম্বাণু যন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি বড়ো থাকে, একে এগ, ওভাম বা উফিয়ার (egg, ovum or oosphere) বলা হয়। বাংলায় একে আমরা ডিম্বাণু বা স্ট্রীগ্যামিট বলি। ডিম্বাণুর দু'পাশের দুটি নিউক্লিয়াসকে সিনারজিড (synergid) বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বা সাহায্যকারী কোষ বলা হয়। জগৎথলির যে মেরু ডিম্বকমূলের দিকে থাকে সে মেরুর নিউক্লিয়াস তিনটিকে প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস বা প্রতিপাদ কোষ বলে।

জগৎথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস, প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে মিলিতভাবে স্ট্রীগ্যামিটোফাইট বলা হয়। ডিম্বকের মধ্যে স্ট্রীগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ট্রীগ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।

প্রতিষ্ঠিত স্ট্রীপেণ্ডে ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে, এর মধ্য থেকে দু'টি মাঝখানে এসে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। জগৎথলি বিকাশের শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের চার দিকে হালকা কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়, তাই বিকশিত জগৎথলি হলো আট নিউক্লিয়াস ও সাত কোষের (সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস দুটি এক প্রাচীর দ্বারা আবৃত হয়) একটি গঠন।

নিষেকক্রিয়া (Fertilization) : অপেক্ষাকৃত বড়ো ও নিচল স্ট্রীগ্যামিটের (ডিম্বাণুর) সাথে ছোটো ও সচল পুংগ্যামিটের (স্রোণুর) যৌন মিলনকে ফার্টাইলাইজেশন (fertilization) তথা নিষেকক্রিয়া, নিষেক বা গর্ভাধান বলে। নিষেকের পূর্বে

৩৬০

জীববিজ্ঞান-প্রথম পত্র

প্রয়োজন পরাগায়ন। অধিকাংশ উদ্ভিদ পরাগায়নের জন্য বায়ু বা প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। ২,৫০,০০০ পুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগের ওপর উদ্ভিদই পরাগায়নের জন্য পতঙ্গ বা অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। পরাগধানী থেকে মুক্ত পরাগরেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে যখন একই প্রজাতির পুষ্পের গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন তাকে পরাগায়ন (Pollination) বলে। সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পরাগায়ন ঘটে থাকে।

নিম্নোক্তকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করা যায়; (i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, (ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি, (iii) পরাগনালিকার জ্ঞপথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিষ্ক্ষিপ্তকরণ এবং (iv) জ্ঞপথলিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন।

(i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : প্রথমে পরাগরেণু স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। গর্ভমুণ্ডের বিশেষ প্রোটিন এবং পরাগরেণুর বিশেষ প্রোটিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। স্বপ্রজাতি শনাক্তকরণের পর পরাগরেণু সেখান থেকে তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বড়ো হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে রেণুরক্ত পথে নলাকারে বের হয়ে আসে যাকে পরাগনালিকা বলে। সাধারণত স্বপ্রজাতি ছাড়া পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় না।

(ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি: পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুণ্ড হতে গর্ভদণ্ডের ভেতর

দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বক পর্যন্ত পৌঁছায়। পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত

সেলুলোজ, পেকটিনেজ ইত্যাদি এনজাইম গর্ভমুণ্ডের

ভেতরের কোষ বিগলন করে অগ্রসরমান পরাগনালিকার

গমন পথ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে

অবস্থিত জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত

হয়ে দুটি শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ

উদ্ভিদে (যেমন-আম, জাম) পরাগনালিকা ডিম্বকরক্ত

পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে porogamy বলে।

ডিম্বক রক্তে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পরাগনালিকা ক্যালসিয়াম

আয়ন বা অন্য রাসায়নিক বস্তুর gradient অনুসরণ

করে। কিছু কিছু উদ্ভিদে (যেমন-Casuarina-ঝাড়)

পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে

chalazogamy বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-

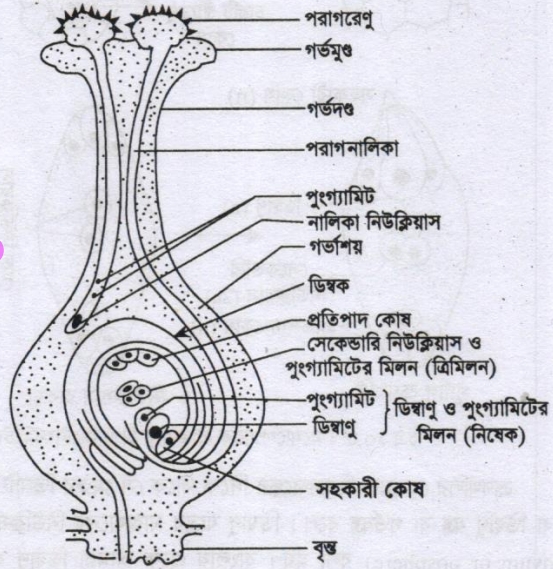
লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক ভেদ করে ডিম্বকে

প্রবেশ করে, একে mesogamy বলে। সাধারণত একটি

মাত্র নালিকাই ডিম্বকে প্রবেশ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে

পোরোগ্যামি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। RU 19-20

(iii) পরাগনালিকার জ্ঞপথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিষ্ক্ষিপ্তকরণ : পরাগনালিকা প্রথমে গর্ভাশয়ের স্তরভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে ডিম্বকে অবস্থিত স্ত্রীরেণু হতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু জ্ঞপথলিতেই অবস্থান করে। পরাগনালিকাও শেষ পর্যন্ত জ্ঞপথলিতে প্রবেশ করে। মনে করা হয় কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ পরাগনালিকার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। জ্ঞপথলিতে প্রবেশ করে এটি সাহায্যকারী কোষের ওপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছে। পরে পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট জ্ঞপথলিতে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়। অনেক সময় পরাগনালিকার চাপে একটি সাহায্যকারী কোষ ধ্বংস হয়ে যায়।



চিত্র ১০.৬ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া।

(iv) জগৎখলিতে ডিম্বাণুর সাথে একটি এবং গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে একটি শুক্রাণুর মিলন : পরাগনালিকা হতে জগৎখলিতে নিষ্ক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ প্রকার মিলনকে সিনগ্যামি (syngamy) বলে। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনই হলো নিষেকক্রিয়া। অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলে।

দ্বিনিষেকক্রিয়া বা দ্বিনিষেক (Double fertilization) : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেকক্রিয়া (double fertilization) বা দ্বিগর্ভাধান প্রক্রিয়া বলে। দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (নগ্নবীজী উদ্ভিদের *Ephedra*-তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয় ১৯৯০ সালে—এটি ব্যতিক্রম)।

এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপর একটি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়; ফলে ডিম্বাণু জাইগোটে পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ট্রিপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন (triple fusion) বলা হয়। কারণ এতে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াস—এ তিনটি নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে।

নিষেক ও দ্বিনিষেক এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিষেক	দ্বিনিষেক
১. সংজ্ঞা	জীবাণুটি তথা ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের যৌন মিলনের নাম নিষেক।	নিষেকের সময় প্রায় একই সাথে ১টি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে এবং অন্য ১টি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হওয়াকে দ্বিনিষেক বলে।
২. কোন উদ্ভিদে ঘটে	এটি অধিকাংশ উদ্ভিদে হয়ে থাকে।	এটি কেবলমাত্র আবৃতবীজী উদ্ভিদে সংঘটিত হয়। (ব্যক্তবীজী <i>Ephedra</i> ব্যতিক্রম)।
৩. গ্যামিটের প্রয়োজনীয়তা	শুধুমাত্র ১টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।	২টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
৪. ফলাফল	শুধুমাত্র জগণের উৎপত্তি হয়।	জগণ ও সস্যটিস্যু উৎপন্ন করে।

MAT 18-19

নিষেকের পরিণতি (After effects of fertilization) : গর্ভাশয় থেকে ফল সৃষ্টি, ডিম্বক থেকে বীজ সৃষ্টি এবং বীজ হতে নতুন বংশধর সৃষ্টি হলো নিষেকের চূড়ান্ত পরিণতি। নিচে নিষেকের পরিণতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১। জগণের পরিস্ফুটন : নিষেকের ফলে অর্থাৎ হ্যাণ্ড্রয়েড (n) ডিম্বাণুর সাথে হ্যাণ্ড্রয়েড (n) শুক্রাণুর যৌন মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড ($n + n = 2n$) কোষের সূচনা হয়, তাকে জাইগোট বা উস্পোর (zygote or oospore) বলে। নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। জাইগোট তার চারপাশে একটি প্রাচীর নিঃসৃত করে এবং কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রজাতি বিশেষে জাইগোটের সুপ্তকাল ভিন্নতর হয়। সুপ্ত অবস্থা কেটে গেলে এতে মাইটোটিক বিভাজন শুরু হয়। প্রথম বিভাজন সাধারণত আড়াআড়ি (transversely) ভাবে হয়, ফলে একটি দ্বিকোষী আদিজগণ (proembryo) গঠিত হয়। আদিজগণটি ক্রম বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ জগণে পরিণত হয়।

২। সস্যের উৎপত্তি : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের (2n) সাথে একটি শুক্রাণুর (n) মিলনের ফলে যে ট্রিপ্লয়েড (3n) এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তা বার বার বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম টিস্যু গঠন করে। এ সময় প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে এসে সস্যটিস্যু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সস্যটিস্যু প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।

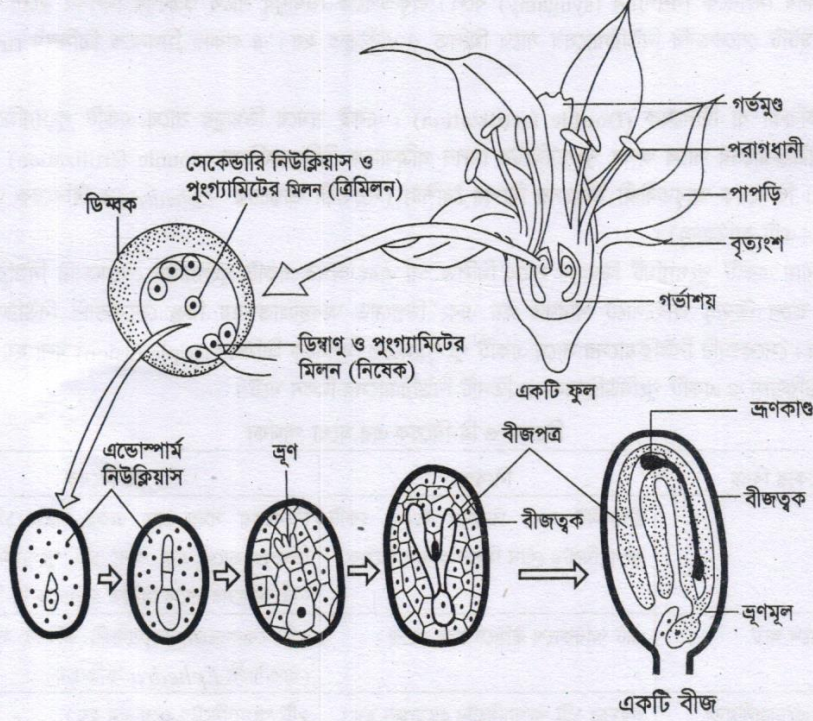
৩। ফল সৃষ্টি : ফল হলো রূপান্তরিত গর্ভাশয় যা নিষেকের পর বিকশিত হয়। নিষেকের ফলে গর্ভাশয় উদ্ভীষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হয়। নিষেক শেষে পুষ্পের স্তবকগুলো নিস্বেজ হয়ে এক সময় ঝরে পড়ে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। গর্ভাশয় জীব-১ম (হাসান)-৪৬

DU 22-23

৩৬২

জীববিজ্ঞান-প্রথম পত্র

পরিপক্ব হয়ে মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথকও হয়ে যায়। ফলের আকার, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। প্রত্যেকটি উদ্ভিদের ফল দেখে তার উৎস-উদ্ভিদকে নিশ্চিত করা যায়। ফল বীজকে পুষ্টি দান করে এবং বিসরণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ফল সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য বীজের বিস্তার ঘটানো।



চিত্র ১০.৭ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

৪। বীজ সৃষ্টি : যান্ত্রবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ডিম্বক (ovule) ক্রমান্বয়ে বীজে পরিণত হয়।

জাইগোট ছুঁ আদিক্রম ক্রমবিভাজন ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি জ্রণ গঠন করে। জ্রণে থাকে বীজপত্র (cotyledon), জ্রণকাণ্ড (plumule) ও জ্রণমূল (radicle)। একই সাথে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম (endosperm) গঠিত হয়। জ্রণ পরিস্ফুটনের সময় জ্রণপোষক টিস্যু (nucellus) জ্রণকে পুষ্টি দান করে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি পরিষ্করণ (মাত্র একটি আবরণ) হিসেবে অবস্থান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এন্ডোস্পার্মও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, এরূপ বীজকে অসস্যবীজ বলে।

নিষেকের পর ডিম্বকের অভ্যন্তরে এরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম্বকের ত্বক দুটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পানি হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয়, যাকে এরিল (aril) বলে। লিচু, কাঠলিচু ও জায়ফলে এরূপ এরিল দেখা যায়। শাপলা বীজেও এরিল আছে। লিচু ও কাঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।

যাহোক নিষেকের পর ডিম্বকটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড়ো, শক্ত ও শুষ্ক হয়ে একটি বীজে পরিণত হয়। অঙ্কুরোদগমের পর বীজ হতে প্রজাতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করে।

প্রজননের সফলতা নির্ভর করে : (i) পরাগায়ন, (ii) নিষিক্তকরণ ও (iii) বীজের বিস্তারের ওপর।

মজ

উদ্ভিদ প্রজনন

৩৬৩

নিষেকের পর গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) এবং ডিম্বকের বিভিন্ন পরিবর্তন	
নিষেকের আগে	নিষেকের পরে বিকশিত হলে
১। গর্ভাশয়	১। ফল
২। গর্ভাশয় প্রাচীর	২। ফলত্বক
৩। ডিম্বক	৩। বীজ MAT 17-18
৪। ডিম্বক বহিঃত্বক বা এক্সাইন	৪। টেস্টা (বীজ বহিঃত্বক)
৫। ডিম্বক অন্তঃত্বক বা ইন্টাইন	৫। টেগমেন (বীজ অন্তঃত্বক)
৬। নিউসেলাস বা ভ্রূণপোষক টিস্যু	৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু থাকলে তা পেরিস্পার্ম (পরিষ্করণ) হয়
৭। ডিম্বাণু বা এগ	৭। ভ্রূণ (embryo)
৮। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	৮। এন্ডোস্পার্ম বা সস্য
৯। সহকারী কোষ বা সিনারজিড	৯। নষ্ট হয়ে যায়
১০। অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদকোষ	১০। নষ্ট হয়ে যায়
১১। মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র	১১। বীজের মাইক্রোপাইল (বীজরন্ধ্র)
১২। হাইলাম বা ডিম্বকনাভী	১২। হাইলাম (বীজনাভী)
১৩। ফিউনিকুলাস বা ডিম্বকনাড়ী	১৩। বীজের বোটা (বীজবৃত্ত) DAT 18-19
১৪। ক্যালাজা বা ডিম্বকমূল	১৪। নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)

RU 23-24

RU 23-24

RU 20-21

নিষেকক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

Headline

১. ক্রোমোসোমের ভারসাম্য রক্ষায় : নিষেক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও পুংগ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় দু' প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোম মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরে আসে। ফলে প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যার স্থিরতা রক্ষিত হয়।
২. ফল ও বীজ সৃষ্টি : নিষেকের উদ্দীপনায় ডিম্বাশয় ও ডিম্বক পর্যায়ক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়।
৩. নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি : নিষেকের ফলে বংশধরদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ ঘটে। কখনো নতুন প্রজাতি সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।
৪. বিবর্তনে : নিষেকের পরে সৃষ্ট প্রকরণ বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করে।
৫. অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল সৃষ্টি : নিষেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল উৎপন্ন হয়।
৬. উদ্ভিদের বংশরক্ষা : নিষেকক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও বীজ সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশরক্ষা করে। বীজের সৃষ্টি না হলে বেশির ভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।
৭. খাদ্যের যোগান : উদ্ভিদের ফল ও বীজের ওপরই প্রাণিকুল বিশেষ করে মানুষ নির্ভরশীল। কাজেই নিষেকক্রিয়া যত না গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদকুলের জন্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানবজাতির জন্য। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, বেল, ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি যা খেয়ে থাকি তা সবই নিষেকক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।
৮. জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি : যৌনপ্রজননে নিষেকক্রিয়ায় জিনের মিশ্রণ (রিকমিনেশন) ঘটে। এর ফলে জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি হয়।

৩৬৪

জীববিজ্ঞান-প্রথম পত্র

যৌন প্রজননের সুফল

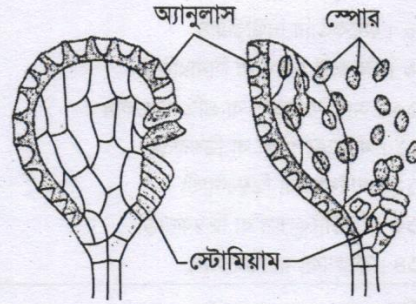
- ১। যৌন প্রজননের ফলে রিকমিনেশনের মাধ্যমে জেনেটিক ডাইভার্সিটি তৈরি হয়।
- ২। জেনেটিক ডাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।
- ৩। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।
- ৪। আমাদের খাদ্য দানা, তৈলবীজ ইত্যাদি এর মাধ্যমেই পেয়ে থাকি।

২। অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) : পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রজনন ঘটে তাকে

অযৌন প্রজনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

- (a) অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে : নিম্নশ্রেণির বেশকিছু উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের রেণু বা স্পোর (spore) তৈরি হয়। এসব স্পোর অঙ্কুরিত হলে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। **অনুকূল পরিবেশে এসব স্পোরে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে এবং নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।**

পরিবেশের তারতম্যে অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন প্রকার স্পোর গঠন করে। এদের মধ্যে পেনিসিলিয়ামের কনিডিয়া (conidia) বা কনিডিওস্পোর (conidiospore), মিউকরের স্পোরানজিওস্পোর (sporangiospore) বা গনিডিয়া (gonidia), অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর (basidiospore) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



চিত্র ১০.৮ : ফার্নের স্পোরাজিয়াম (বোঁয়ে) ও এর বিদারণ (ডানে)

এদিকে শৈবালের মধ্যে ক্ল্যামাইডোমোনাস চলরেণু বা জুওস্পোর (zoospore) এবং স্থিররেণু (resting spore) বা অ্যাকাইনেটি (akinetete) এবং অন্যান্য বহু শৈবালের ভুল প্রাচীরাবদ্ধ অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (aplanospore) ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের অযৌন স্পোর। এছাড়া ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের রেণুথলিতে (sporangium) উৎপন্ন রেণুগুলো অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তারে সহায়ক। ফার্ন (fern) ও লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium)-এর স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homoporous), কিন্তু সেলাজিনেলা (Selaginella), শুশনি শাক (Marsilea) ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস (heterosporous)।

(b) দেহ অঙ্গের মাধ্যমে : আবৃতবীজী উদ্ভিদে দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন হয়ে থাকে। **একরূপ জননকে অঙ্গজ প্রজনন (vegetative reproduction) বলা হয়।** অন্যভাবে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ নতুন জীব সৃষ্টি করলে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্গজ প্রজনন হয়ে থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়েও অঙ্গজ প্রজনন করা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ প্রজনন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

(ক) উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন : নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন ঘটতে পারে।

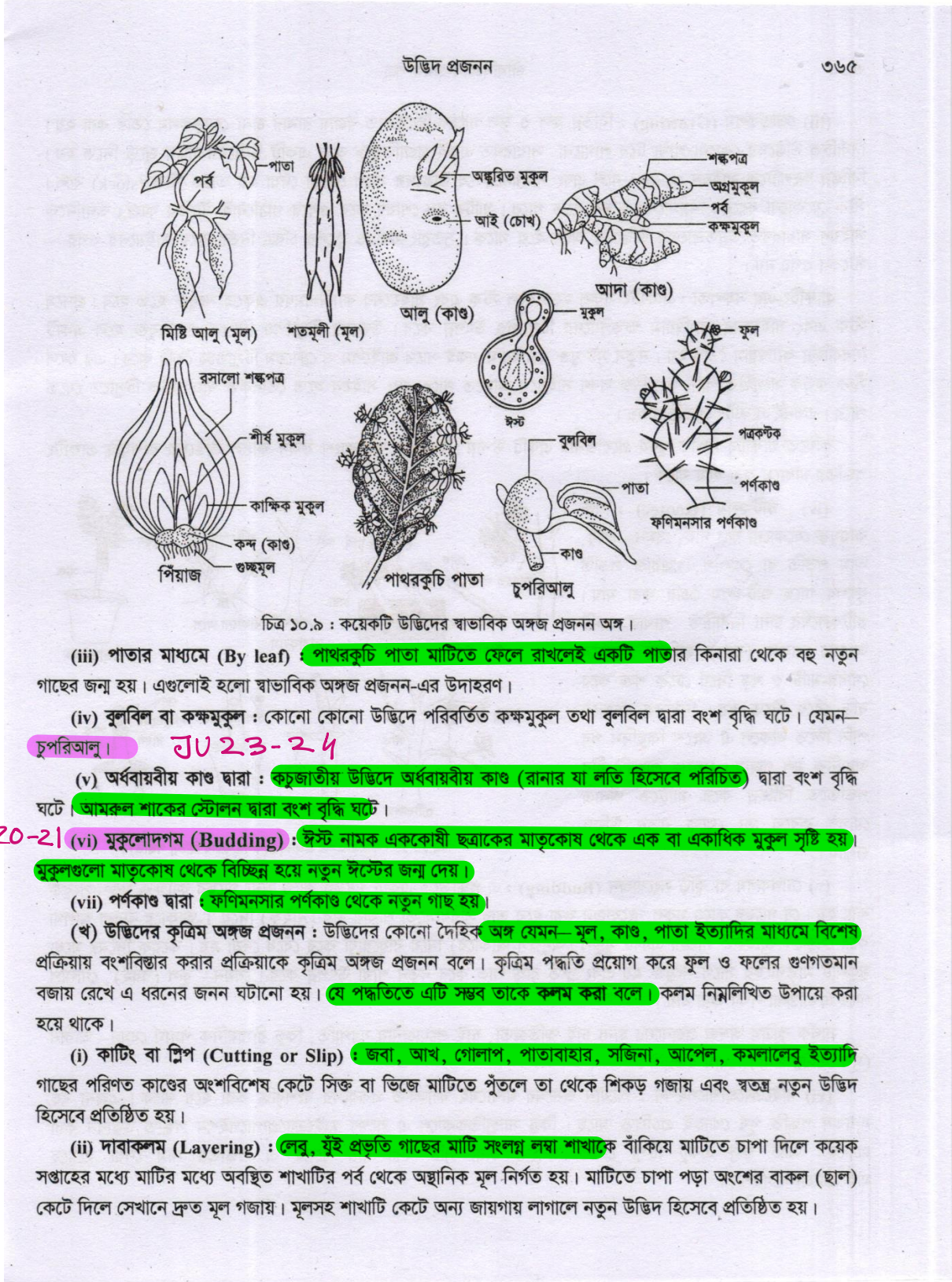
(i) মূল দ্বারা (By roots) : মিষ্টি আলু, ডালিয়া, শতমূলী, কাঁকরোল, পটল প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল থেকেই নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। জমিতে এদের মূল লাগানো হয়।

(ii) কাণ্ড দ্বারা (By stem) : গোলআলু, আদা, পিঁয়াজ, সটি, ওলকচু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। কলা, পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ এগুলোর সাকার-এর (বিশেষ কাণ্ড) সাহায্যে প্রজনন হয়।

RU 20-1

MAT 15-16

RU 23-24



৩৬৬

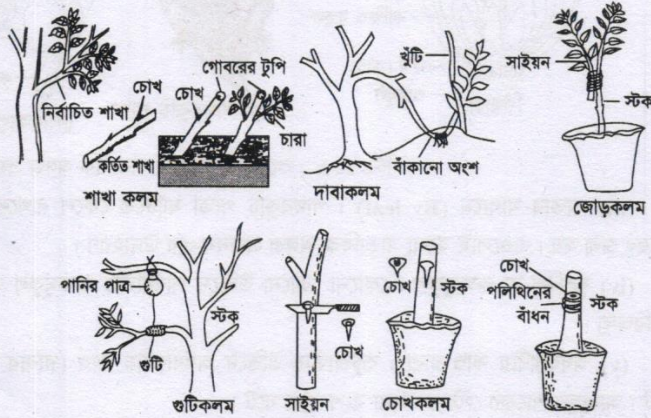
জীববিজ্ঞান-প্রথম পত্র

(iii) জোড়কলম (Grafting) : বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের উন্নতজাত বজায় রাখার জন্য জোড়কলম তৈরি করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদের কোনো শাখা টবে লাগানো সাধারণত একই প্রজাতিভুক্ত অন্য একটি উদ্ভিদের সাথে জুড়ে দিতে হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সাইয়ন (scion) বলে এবং সাইয়নকে যে উদ্ভিদের সাথে জোড়া দেয়া হয় তাকে স্টক (stock) বলে। স্টক যেকোনো ধরনের নিম্নমানের উদ্ভিদ হতে পারে। মাটির রস শোষণ করে ওপরে পাঠানোই স্টকের কাজ। অন্যদিকে সাইয়ন সাধারণত উন্নতজাতের উদ্ভিদের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ফল ও ফুলের চরিত্র নির্ভর করে সাইয়নের ওপর— স্টকের ওপর নয়।

গ্রাফটিং-এর সফলতা : গ্রাফটিং সফল হতে হলে স্টক এবং সাইয়নের ক্যাম্বিয়ামদ্বয় একত্রে সংযুক্ত হতে হবে। প্রথমে স্টক এবং সাইয়নের ক্যাম্বিয়াম ক্ষতপূরণের টিস্যুপিণ্ড উৎপন্ন করে। উভয়ের টিস্যুপিণ্ড মিলিত ও সংযুক্ত হলে একটি নিরবচ্ছিন্ন ক্যাম্বিয়াম তৈরি হয়। নতুন সৃষ্ট যুক্ত ক্যাম্বিয়াম একই সাথে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। এর ফলে স্টক কর্তৃক সংগৃহীত পানি ও খনিজ লবণ সাইয়নে আসতে পারে এবং সাইয়ন হতে তৈরিকৃত খাদ্য স্টক টিস্যুতে যেতে পারে। তখনই গ্রাফটিং প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষিতে গ্রাফটিং পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপায়। বর্তমানে অধিকাংশ ফলদ কাঠল উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি গ্রাফটিং পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

(iv) গুটিকলম (Gootee) : শক্ত কাণ্ডযুক্ত যেকোনো ফল গাছ, যেমন— লেবু, আম প্রভৃতি বা গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত শাখার একটি অংশের বাকল (ছাল) ছাড়িয়ে সেখানে গোবর-মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। নিয়মিত সেখানে পানি দিতে থাকলে ঐ অংশে কিছুদিন পর অস্থানিক মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি ধীর পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে অন্যত্র রোপণ করলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।



চিত্র ১০.১০ : কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন। (কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি)।

(v) চোখকলম বা কুঁড়ি সংযোজন (Budding) : এ পদ্ধতিতে একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাস্থিক মুকুল সংযুক্ত করা হয়। যে গাছের কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হবে তার সুবিধামতো শাখায় ছুরি (নাইফ) দিয়ে 'A'-আকারে বাকল আলগা করে সেখানে কাস্থিকত গাছের একটি মুকুল (অনুরূপ আকারে) নিয়ে বায়ুরোধী করে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যে মুকুলটি মাতৃগাছের সাথে সংযুক্ত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। যেমন— কুল (বরই), গোলাপ গাছে এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

MAT 20-21

সার্থক কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের জন্য চাই অভিজ্ঞতা, চাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন— অক্সিন (মূল তৈরির জন্য), মোম ইত্যাদি।

(vi) মাইক্রোপ্রোপাগেশন : অযৌন জননের মাধ্যমেই কাস্থিকত প্রকরণের বংশবৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এজন্য বহু সনাতন পদ্ধতি পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ লক্ষ্যে মাইক্রোপ্রোপাগেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র একটু টিস্যু থেকে অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায় বলেই এ পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে মাইক্রোপ্রোপাগেশন।

সুবিধা

✓ প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিসমূহের তুলনায় এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে যেকোনো কাক্ষিত নতুন প্রকরণের অসংখ্য চারা উৎপাদন করে অল্প সময়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেয়া যায়।

✓ ভাইরাসমুক্ত চারা তৈরি করা যায়।

✓ বিরল উদ্ভিদের বহুসংখ্যক চারা উৎপাদন করে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা যায় (এবং বন্য আবাস থেকে আহরণ কমানো যায়)। (টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এটা করা হয় : বিস্তারিত জীবপ্রযুক্তি অধ্যায়)

উচ্চতর উদ্ভিদেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযৌন জননই বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Novel Orange এর উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রাজিলে কমলার বীজ থেকে এমন একটি চারা হয় যার পুষ্পপত্রসমূহ বিকশিত হয় না কিন্তু উন্নতমানের বীজহীন কমলার ফলন হয়। বর্তমানে উৎপাদিত সকল Novel Orange এ এক গাছেরই অযৌন জননের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গাছ থেকে আসছে।

অপুংজনি (Parthenogenesis) : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সাধারণত ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন তথা নিষেকের ফলে জ্রণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি জ্রণ সৃষ্টি করে থাকে। যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই জ্রণ সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বীজে পরিণত হয় তাকে পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি বলে। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পার্থেনোকার্পি (parthenocarp) বলে। উদাহরণ- লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি। আমরা যে বীজহীন কলা খাই তাও একটি পার্থেনোকার্পিক ফল।

পার্থেনোজেনেসিস প্রধানত দু'প্রকার। যথা : (i) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস এবং (ii) ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস।

(i) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Haploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি হলেও তা নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি জ্রণের সৃষ্টি করে তখন তাকে হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড হয় এবং অনুর্বর হয়। *Solanum nigrum*, *Orchis maculata* উদ্ভিদে অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

DV 22-23

(ii) ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Diploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ার বদলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু (2n) সৃষ্টি হয় এবং পরে জ্রণে পরিণত হয় তাকে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস বলে।

DV 22-23 *Parthenium argentatum* ও *Taraxacum albidum* উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায়।

Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে জ্রণ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে জ্রণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (androgenesis) বলে।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস : বাহ্যিক আবেশের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বহু উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব। পুংগ্যামিট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে জ্রণ উৎপন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োগে, ইম্যাকুলেশনের পর পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেলভিটান জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব।

পার্থেনোজেনেসিস-এর গুরুত্ব : উদ্ভিদের প্রজননে পার্থেনোজেনেসিস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায় (যেমন— *Solanum nigrum*, *Parthenium argentatum*) তাদের স্বাভাবিক প্রজনন যৌন প্রকার।

■ কোনো উদ্ভিদে যদি অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন না ঘটে কেবল পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম হলে ঐ উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বা বিলুপ্তির হাত থেকে প্রজাতিটি রক্ষা পায়।

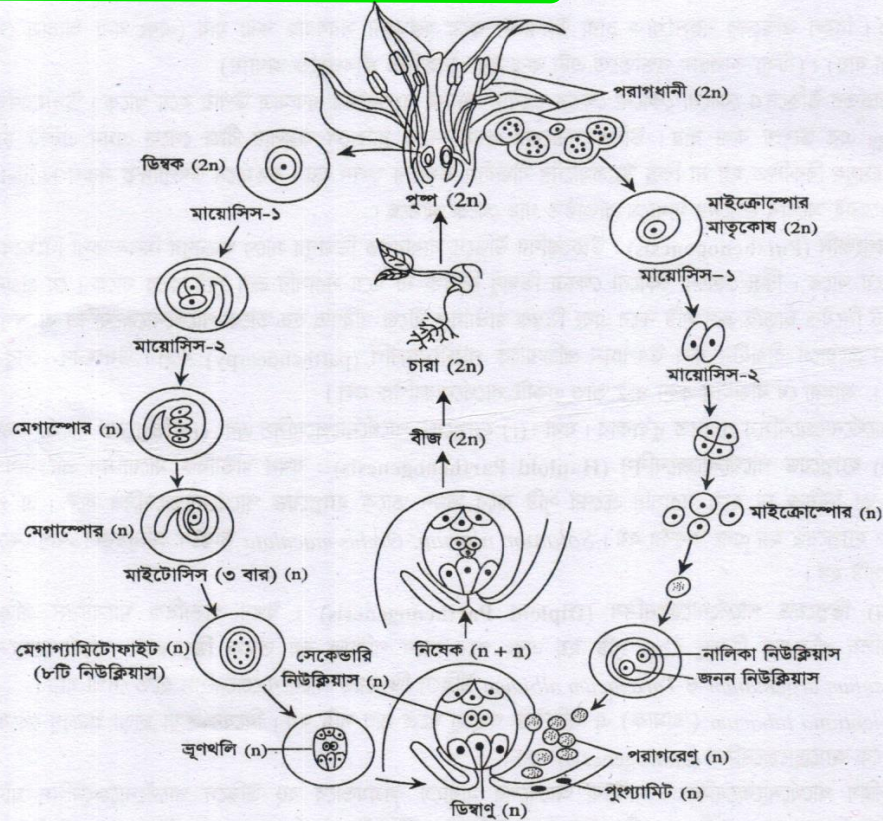
■ এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না।

■ এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সুবিধাজনক মিউটেন্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে।

■ এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ ব্রিডিং গবেষণার কাজে লাগানো যায়।

RU 21-22

অ্যাপোস্পোরি (Apospory) : ডিম্বকের (ovule) যেকোনো দেহকোষ থেকে (যেমন— ডিম্বক ত্বক, নিউসেলাস) ডিম্পুয়েড জগ্ৰখলি (embryo sac) সৃষ্টি হতে পারে। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্টি ডিম্পুয়েড জগ্ৰখলির ডিম্পুয়েড ডিম্বাণুটি হতে নিষেক ছাড়াই জগ্ৰ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপোস্পোরি। অ্যাপোস্পোরি প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি উদ্ভিদ ডিম্পুয়েড হয় এবং মাতৃউদ্ভিদের সমগ্ৰসম্পন্ন হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে এরূপ হতে দেখা যায়।



চিত্র ১০.১১ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে অনুক্রম।

অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (Adventitive embryony) : ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলোসের যেকোনো কোষ হতে ক্রমখলি গঠন ছাড়াই (অ্যাপোমস্পোরিতে ক্রমখলি গঠিত হয়) ক্রম সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (adventitive embryony)।

MAT 21-22

অ্যাপোগ্যামি (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া জগণথলির অন্য যেকোনো কোষ (যেমন- সহকারী কোষ, প্রতিপাদকোষ ইত্যাদি) থেকে জগণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। এক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই জগণ সৃষ্টি হয়। *Allium*-এ এরূপ লক্ষ্য করা যায়।

পার্শ্বনোজেনেসিস, অ্যাস্পোস্পারি, অ্যাস্পোগ্যামি এবং অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি এর প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই নিষেক ছাড়া ক্রণ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু, ক্রণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া ক্রণ তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যাগামোস্পার্মি (agamospermy)। অ্যাগামোস্পার্মি অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যকীয় হলে তাকে বলা হয় সিউডোগ্যামি (Pseudogamy)। শীস তৈরির জন্যই পরাগায়নের প্রয়োজন হয়— ক্রণ তৈরির জন্য নয়।

পার্শ্বনোজেনেসিস ও যৌন প্রজনন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থকের বিষয়	পার্শ্বনোজেনেসিস	যৌন প্রজনন
১। গ্যামিট	পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	পুং ও স্ত্রী উভয় গ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
২। নিষেক	নিষেকের প্রয়োজন হয় না।	নিষেকের প্রয়োজন হয়।
৩। অপত্য সৃষ্টি	অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।	নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট থেকে পরিণত অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।
৪। চারিত্রিক গুণাবলি	অপত্যের মধ্যে কেবল মাতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।	অপত্যের মধ্যে মাতা-পিতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।

অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য

পার্থকের বিষয়	অযৌন প্রজনন	যৌন প্রজনন
১। গ্যামিট	গ্যামিট সৃষ্টি হয় না এবং গ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	গ্যামিট সৃষ্টি হয় এবং দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের মিলন ঘটে।
২। কোষবিভাজন	মায়েসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয় না।	মায়েসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়।
৩। বৈচিত্র্য	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪। অভিযোজন	সৃষ্ট উদ্ভিদ কম অভিযোজনক্ষম হয়।	সৃষ্ট উদ্ভিদ অধিক অভিযোজনক্ষম হয়।
৫। কোথায় ঘটে	সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।	নিম্ন ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।
৬। নিষেক	নিষেক ঘটে না।	নিষেক ঘটে।

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল সাদা শাপলায় মুখ্য প্রজনন প্রক্রিয়া অযৌন। শাপলার ভূনিম্নস্থ প্রধান মৌল কাণ্ড থেকে চারপাশে ছোটো ছোটো টিউবার (শালুক) সৃষ্টি হয়। প্রতিটি টিউবার অর্থাৎ শালুক বিচ্ছিন্ন হয়ে পরবর্তীতে অঙ্কুরায়নের মাধ্যমে এক একটি স্বতন্ত্র শাপলা উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাল শাপলাতে সাধারণত ফল সৃষ্টি হয় না, এদের প্রজনন সম্পূর্ণ অযৌন।

জাতীয় ফুল কাঁঠালের প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন প্রক্রিয়া যা বীজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম মুৎগত।

জাতীয় বৃক্ষ আম-এর স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন প্রক্রিয়া, যা বীজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে পরপরায়ণের কারণে ফলের স্বকীয় স্বাদ বজায় থাকে না। তাই উদ্যানতত্ত্ববিদ্যায় কৃত্রিম বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় কৃত্রিম অঙ্গজ (অযৌন) প্রজনন প্রক্রিয়ায় যা কলম সৃষ্টি বা গ্রাফটিং-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম মুৎগত।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলজ উদ্ভিদ পদ্ম অযৌন প্রজনন তথা অসীম বৃদ্ধিসম্পন্ন রানার (রাইজোম কাণ্ড) কাণ্ডের মাধ্যমে অতি দ্রুত বিরাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েও স্বতন্ত্র গাছ হতে পারে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Reproduction of Plants)

বর্তমানে প্রচলিত ফসল হতে আরো উন্নত বৈশিষ্ট্যের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে ব্রিডিং (breeding) বলা হয়। নির্বাচন (selection), সংকরায়ন (hybridization), মিউটেশন (mutation) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের উন্নত নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়। দুটি বিসদৃশ নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে সংকর (hybrid) উদ্ভিদ বলা হয়। উন্নত নতুন ফসল সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন (hybridization) তথা সংকরায়ন অন্যতম। প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবেও কিছু কিছু হাইব্রিডাইজেশন ঘটে থাকে, তবে সাধারণত কৃত্রিম উপায়েই হাইব্রিডাইজেশন ঘটানো হয়। সংকরায়ন হলো উদ্ভিদ সুপ্রজননের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন ডারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়।

ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু' বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস (cross) করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (artificial hybridization) বা সংকরায়ন। সাধারণত উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি করা হয়।

কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (সংকরায়ন) প্রক্রিয়া বা কৌশল: কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

১। **প্যারেন্ট নির্বাচন:** কাদের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন করতে হবে তা নির্বাচন করাই হলো প্যারেন্ট নির্বাচন।

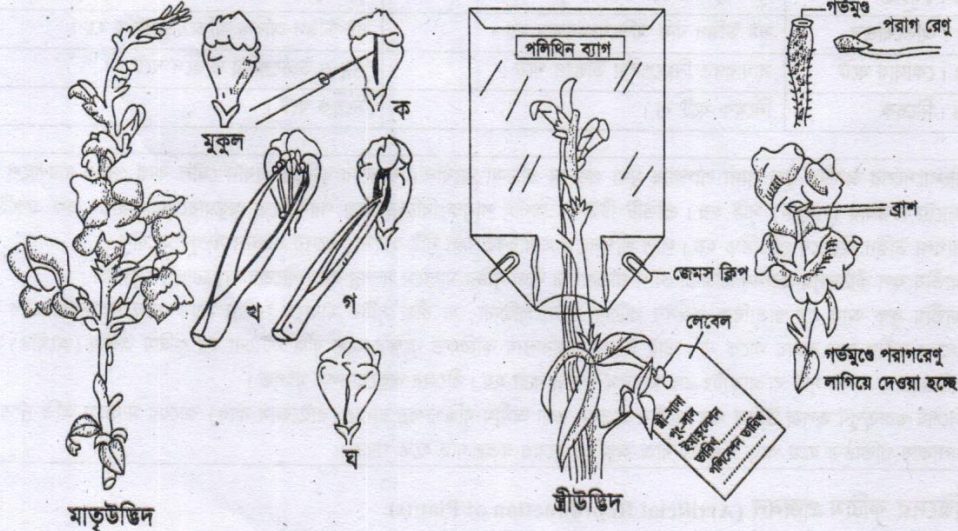
২। **প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন:** প্যারেন্ট স্বপরাগী না হলে এদেরকে কৃত্রিম স্বপরাগায়নের মাধ্যমে হোমোজাইগাস (homozygous) করা হয়।

৩। **প্যারেন্ট উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন:** যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হবে তা যদি উভলিঙ্গ (এবং স্বপরাগী হয় অথবা প্রয়োজনে স্বপরাগী হতে পারে) হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। **পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর মেরে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় ইমাস্কুলেশন।** এতে করে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না।

৪। **ব্যাগিং:** পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে ক্রসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদের পুষ্পিত অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়।

৫। **ক্রসিং:** ব্যাগিং করা পুং উদ্ভিদ হতে পুংরেণু সংগ্রহ করে ব্যাগিং করা স্ত্রী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেটেড পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে ফেলা হয়।

৬। **লেবেলিং:** ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং-এর তারিখ, মাতৃ ও পিতৃ উদ্ভিদ পরিচিতি সম্বলিত একটি লেবেল স্ত্রী উদ্ভিদে লাগিয়ে দেয়া হয়।



চিত্র ১০.১২ : ক্রসিং-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক-ঘ ইমাস্কুলেশন) বা সংকরায়ন।

৭। **বীজ সংগ্রহ:** কৃত্রিম পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট ফলটি পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

৮। **বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব:** পরবর্তী বছর কৃত্রিম ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলো বপন করা হয় এবং F_1 -বংশধর সৃষ্টি হয়। F_1 -বংশধরগুলো হলো নির্বাচিত প্যারেন্টের হাইব্রিড। পরে F_2 F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি করে উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়।

৯। **F_1 বংশধরের ব্যবহার ও নতুন প্রকরণ সৃষ্টি:** F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো F_2 বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে একটি নতুন প্রকরণের জন্ম হয়।

প্রকৃতপক্ষে ৩ হতে ৬ নম্বর ধারাকে মিলিতভাবে কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল বলা হয়।

সংক্রায়ন পদ্ধতির সতর্কতা (Precaution)

- ১। প্যারেন্ট নির্বাচন করার সময় তাদের পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হয়।
- ২। ইমাস্কুলেশন ও পরাগায়নের সময় হাত, সূঁচ, চিমটা, তুলি প্রভৃতি স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়।
- ৩। লক্ষ্য রাখতে হবে, ইমাস্কুলেশনের সময় যেন একটি পুংকেশরও থেকে না যায় এবং গর্ভকেশরের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
- ৪। ব্যাগিং ঠিকমতো করতে হবে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে হবে।
- ৫। সংকর বাজ সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে কলা-কৌশল গ্রহণ সঠিকভাবে নিতে হবে।

বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। **নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:**

ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি : বিবর্তনের আধুনিক ধারণা মতে মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় যার মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন (বৈচিত্র্যের) সৃষ্টি হয়।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত তৈরি : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধক্ষম জাত তৈরি করা যায়। এ জাত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি : শস্যের সর্বোচ্চ ফলনের প্রধান সমস্যা হলো রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। **BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (বিআর-১০), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫)। এগুলো রোগ প্রতিরোধী জাত।** **DAT 21-22**

গুণগত মান উন্নয়ন : খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দীর্ঘ সংরক্ষণ সময় ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে উদ্ভিদের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায়।

আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ : বন্যার কারণে অনেক নিম্নভূমির আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার ঝড়ের প্রকোপেও অনেক ফসল নষ্ট হয়। **কৃত্রিম সংক্রায়নের মাধ্যমে ফসলের আবাদকাল ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কমানো সম্ভব।** এতে বন্যার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যাবে। **MAT 14-15**

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিমিত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে ফসলের অসংখ্য উন্নত ফলনশীল জাত। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই আবার রোগ ও ক্ষরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফলন বেড়ে চলেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(১) উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, (২) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৩) প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৪) উচ্চফলনশীল হাইব্রিড উদ্ভাবন, (৫) দৃষ্টিনন্দন অর্কিড উদ্ভাবন, (৬) দৃষ্টিনন্দন গোলাপ উদ্ভাবন, (৭) নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন, (৮) বীজহীন ফলের জাত উদ্ভাবন, (৯) অধিক ফলনশীল শাক-সবজির জাত উদ্ভাবন এবং (১০) প্রাণীর কৃত্রিম প্রজননে বহু উন্নত জাত উদ্ভাবন। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

□ **উচ্চফলনশীল ধানের জাত সৃষ্টি :** ১৯৬০ এর দশকে ফিলিপিনসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (IRRI-International Rice Research Institute) বিজ্ঞানিগণ ইরি ধান উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান ইরি-২০, ইরি-৮, ইরি-৫, ইরি-২৮, ইরি-২৯ ইত্যাদি। একরপ্তি এদের ফলন বেড়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে (BRRI-Bangladesh Rice Research Institute) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান চান্দিনা, বিরিশাইল, ইরিশাইল ইত্যাদির ফলনও অনেক বেশি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি উফসী জাতের নাম হলো- চান্দিনা (বিআর-১), মালা (বিআর-২), শাহী বালাম (বিআর-১৫) এবং শ্রাবনী (বিআর-২৬)। গত ৪০ বছরে এশিয়ায় ধানের উৎপাদন কমপক্ষে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিক ফলনশীল ইরি বা বিরি ধান উদ্ভাবনের আগে পৃথিবীর এ অঞ্চলে, বিশেষ করে আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে কয়েক বছর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, অথচ তখন লোকসংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম এবং ধান চাষের জমিও ছিল অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ হলো তখন ধানের ফলন একরপ্রতি খুবই কম ছিল, ফলে কোনো বছর আগাম বন্যা বা খরা দেখা দিলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। তখনকার সময়ে চাষকৃত জাতগুলোর একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন ছিল ৩০-৩৫ মণ। **বর্তমানে চাষকৃত উচ্চফলনশীল জাতের একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন হয় ৭০-৯০ মণ।**

ইরি-৮, ইরি-৫, ইরিশাইল এগুলো উচ্চফলনশীল ধানের জাত। **ইন্দোনেশিয়ান পেটাদান ও তাইওয়ানের ডি. জি. উজেন** ধানের মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে ইরি-৮। এর একরপ্রতি ফলন ৯০-১০০ মণ। ইরি-৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটা ধান ও টোংকাই ধান এর সংকর করে। ইরি-৫ এর ফলন একরপ্রতি ৭০-৭৫ মণ। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ইরিশাইল উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটাদান, ভারতের টি. কে. এম-৬ ধান এবং তাইওয়ানের টাইচু-১ এর মধ্যে সংকর করে। এর একরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ মণ। এমনিভাবে বিআর-২০ এবং বিআর-৩ এর মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিরিশাইল। বিআর-২৮ এবং বিআর-২৯ আরও উন্নত জাত।

কৃষকের কাছে বোরো মৌসুমে চাষের জন্য সবচেয়ে প্রিয় ধান ব্রি-২৮ এবং ব্রি-২৯। ব্রি-২৯ এর চাল সরু এবং লম্বা। সম্প্রতিকালে এ জাত দুটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে এবং সহজেই রাষ্ট্র রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই গত ১৬/৫/২০২৩ তারিখের কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ জাত দুটিকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

ব্রি-২৮ এর বিকল্প হিসেবে ব্রি-৬৮, ৮১, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ১০১, ১০৫ এবং বঙ্গবন্ধু-১০০ আবাদ করা যেতে পারে। ব্রি-২৯ এর বিকল্প হিসেবে ব্রি-৮৯, ৯২, ৯৭, ৯১, ১০২, বঙ্গবন্ধু-১০০, বিনা-২৫; লবণাক্ত এলাকায় বিনা-১০ চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে।

□ **উচ্চফলনশীল গমের জাত তৈরি :** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষকৃত গমও কৃত্রিম প্রজননের ফসল। আগে গমের ফলন হতো খুবই কম। তাছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। ফসল রক্ষার জন্য তখন লক্ষ লক্ষ ডলারের ওষুধ প্রয়োগ করতে হতো। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বর্তমান গমের ফলনও বেশি। আবার রোগ প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় ওষুধ প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। এর ফলে খরচ কম হয়, অথচ ফসল বেশি পাওয়া যায়।

অনেক আগে যে গমের চাষ হতো তার ফলন ছিল খুবই কম, তাছাড়া এর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও ছিল কম। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে উন্নতজাতের গম, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষ করা হয়।

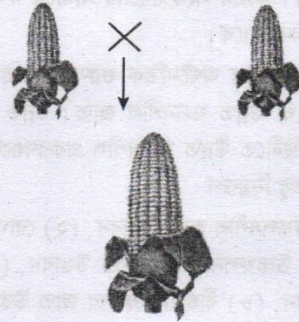
মেক্সিকোর (CIMMIT) সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ১৭ জাতের উফশী গম উদ্ভাবন করেছে।

এসব জাতের মধ্যে বলাকা, কাঞ্চন, আনন্দ, আকবর, বরকত ও সওগাত বেশ জনপ্রিয় জাত। উচ্চফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman Earnest Borlaug ১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

□ **উন্নত জাতের ভুট্টা উৎপাদন :** আমেরিকার বিজ্ঞানী G. H. Shull ১৯০৮ সালে ভুট্টার সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টির মাধ্যমে ভুট্টার দানা উৎপাদনে দারুণভাবে সফল হন। এরপর ভুট্টার দ্বি-সংকর পদ্ধতিতে এর উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে।

□ **উন্নত জাতের ফুল ও অর্কিড উৎপাদন :** বর্তমান সময়ে চাষকৃত অধিকাংশ ফুলই সংকরায়নের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বছর বহু অর্কিড সৃষ্টি করা হচ্ছে সংকরায়নের মাধ্যমে। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে যে জাত তৈরি হচ্ছে তার ফলে ফুল চাষে বিপ্লব ঘটছে। **যেমন— গোলাপের হাইব্রিড-টি, ফোরিবাভা, মেরিগোল্ড, গ্র্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা ইত্যাদি প্রায় সব জাতই হাইব্রিড।**

□ **হাইব্রিড ফল ও সবজি উৎপাদন :** কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে আম, তরমুজ, আপেল, বরই ইত্যাদি ফল এবং মিষ্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, বিজ্জা, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। **বীজহীন ফল ও সবজি কৃত্রিম প্রজননের সুফল।**



চিত্র ১০.১৩ : হাইব্রিড ভুট্টার সৃষ্টি।

□ রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন : বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ফলে প্রচুর পরিমাণে আবাদি ফসলের ফলনহানী হয়ে থাকে। বুনো প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় সংকরায়নের মাধ্যমে এ বৈশিষ্ট্য আবাদি জাতে কৃত্রিমভাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী জাত উৎপাদন করা সম্ভব। **BRR1 উদ্ভাবিত মুক্তা (BR-10), গাজী (BR-14), মোহিনী (BR-15), শাহী বালাম (BR-16) প্রভৃতি ধানের রোগ প্রতিরোধী জাত**

□ প্রতিকূল সহিষ্ণুতা : ফসল ও স্থানভেদে কোনো কোনো ফসলের অতিবৃষ্টি, খরা, শীত প্রভৃতি এক বা একাধিক প্রতিকূলতা প্রতিরোধী জাতে সৃষ্টির আবশ্যিকতা দেখা দেয়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

□ অধিক অভিযোজন ক্ষমতা : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সৃষ্টি করা উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা বেশি থাকায় এরা বিচিত্র আবহাওয়া ও জলবায়ুতে জন্মাতে সক্ষম।

□ বীজ ঝরে পড়া স্বভাবের পরিবর্তন : ফসল সংগ্রহের আগে মাঠ পর্যায়ে কোনো শস্যের ফল থেকে বীজ ঝরে যেতে থাকে তবে তা ফলনকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটা মুগ ডালজাতীয় উদ্ভিদে দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা একান্ত দরকার।

□ একই সময়ে পরিপক্বতা : একই শস্য ক্ষেত থেকে একাধিকবার ফসল সংগ্রহের জন্য বেশি পরিশ্রম ও অর্থের দরকার। একই সময় পরিপক্ব হয় সেরূপ শস্য উদ্ভাবন করা দরকার। এটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সম্ভব।

□ উদ্ভিদ বিবর্তন : কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। বিবর্তনের আধুনিক ধারণা অনুযায়ী জিন মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন ও জেনেটিক রিকম্বিনেশন নির্বাচন হলো প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

□ অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধান উদ্ভাবন করেন ড. ইউয়ান লংপিং। এখন বহু কৃষক অধিক ফলনশীল হাইব্রিড বীজ চাষ করেন।

সার-সংক্ষেপ

প্রজনন : জীব থেকে নতুন শিশু জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়াই প্রজনন। প্রজনন জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মাতৃউদ্ভিদ থেকে নতুন শিশু উদ্ভিদসৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো উদ্ভিদ প্রজনন। উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন করতে পারে। উপায়গুলো হলো— অঙ্গজ জনন, যৌন জনন, পার্থেনোকার্পিক জনন। মূল ও কাণ্ডের বিভিন্ন উপবৃদ্ধি থেকে যে জনন হয় তা হলো অঙ্গজ জনন। ফুল সৃষ্টির মাধ্যমে যে প্রজনন হয় তা হলো যৌন প্রজনন। ফুল থেকে বীজ হয়, তাই বীজ দ্বারা যে প্রজনন হয় তা যৌন প্রজনন।

নিষেক : নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের সাথে সচল পুংগ্যামিটের মিলনকে নিষেক বা নিষেকক্রিয়া বলা হয়। নিষেক ক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো পরাগায়ন। পরাগায়নের মাধ্যমে একই উদ্ভিদের অথবা একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের পরাগধানী হতে পরাগরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়। গর্ভমুণ্ডে পতিত হওয়ার পর পরাগরেণু পরাগনালিকা সৃষ্টির মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। পরাগনালিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভদণ্ড পার হয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে শুক্রাণু সৃষ্টি হয়। পরাগনালিকা শেষ পর্যন্ত জগথলিতে প্রবেশ করে। শুক্রাণু জগথলি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। একই সময়ে অপর একটি শুক্রাণু জগথলিতে অবস্থিত সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে দ্বিনিষেক সম্পন্ন করে। নিষেকের পর নিষিক্ত ডিম্বাণু পরিপূর্ণ হয়ে বীজে পরিণত হয়।

সংকরায়ন : কোনো ভালো বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছের পরাগরেণু একই প্রজাতির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গাছের গর্ভমুণ্ডে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংকরায়ন (hybridization)। অন্যভাবে বলা যায়, সংকরায়ন হলো এমন প্রজনন পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন উন্নত ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়। একটি নাতিদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করা হয়। ধানের ইরি বা বিরির বিভিন্ন উন্নত ফলনশীল প্রকরণ এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে দক্ষতা অর্জন

- ১। যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে তাই প্রজনন বা প্রজনন প্রক্রিয়া। অপত্য বংশধর সৃষ্টি করাই প্রজনন। প্রজনন জীবের অনন্য বৈশিষ্ট্য।
- ২। প্রজনন প্রক্রিয়া প্রধানত তিন প্রকার। যথা— (i) যৌন প্রজনন, (ii) অযৌন প্রজনন এবং (iii) পার্থেনোজেনেসিস।
- ৩। আবৃতবীজী উদ্ভিদ-এর যৌন প্রজনন অঙ্গ হলো ফুল।
- ৪। উদ্ভিদের যৌন প্রজননের জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপই ফুল।

Must

৩৭৪

জীববিজ্ঞান-প্রথম পত্র

- ৫। ফুলের পুংকেশরে পরাগধানী থাকে। পরাগধানীর অভ্যন্তরে পরাগমাতৃকোষের মায়োসিস বিভাজনে সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড কোষই পরাগরেণু।
- ৬। সাধারণত চারটি পরাগরেণু হালকাভাবে এক সাথে অবস্থান করে। এ অবস্থায় একে পরাগচতুষ্টয় বা পোলেন টেট্রাড বলে।
- ৭। একটি পরাগধানীর পরাগরেণুসমূহ একসাথে গুচ্ছবদ্ধভাবে অবস্থান করলে সেই পরাগগুচ্ছকে পলিনিয়াম বলে। Orchidaceae, Asclepiadaceae গোত্রে পলিনিয়াম দেখা যায়।
- ৮। পরাগরেণুর বাইরের ত্বকে (এক্সাইন) থাকা ছিদ্রকে জার্মপোর, রেণুরন্ধ্র, বা জনন ছিদ্র বলে।
- ৯। পরাগরেণু হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।
- ১০। পরাগনালিকাতে দুটি পুংগ্যামিট সৃষ্টি হয়।
- ১১। ডিম্বকের অগ্রভাগের ত্বকবিহীন অংশকে মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র বলে।
- ১২। ডিম্বক প্রধানত চার প্রকার। (i) উর্ধ্বমুখী, (ii) অধোমুখী, (iii) পার্শ্বমুখী এবং (iv) বক্রমুখী।
- ১৩। ডিম্বক ত্বক দিয়ে আবৃত টিসুই নিউসেলাস বা ভ্রূণপোষক টিসু।
- ১৪। ডিম্বকের নিউসেলাসে সৃষ্ট থলির ন্যায় অঙ্গকে ভ্রূণথলি বলা হয়।
- ১৫। মেগাস্পোর বা স্ত্রীরেণু হলো স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।
- ১৬। শতকরা ৭৫ ভাগ উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। মনোস্পোরিক-এ একটি মাত্র স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে।
- ১৭। দ্বিনিষেক : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেক বলা হয়। দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।
- ১৮। ত্রিমিলন (Triple fusion) : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন বলে। মিলনের ফলে ট্রিপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তা থেকে সস্যকলা সৃষ্টি হয়।
- ১৯। নগ্নবীজী Ephedra-তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয়েছে।
- ২০। নিষেকের পর পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও বিকশিত গর্ভাশয়ই ফল।
- ২১। নিষেকের পর বিকশিত ডিম্বকই বীজ।
- ২২। যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু নিষেক ছাড়াই ভ্রূণে পরিণত হয় এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয় তাকে পার্থেনোজেনেসিস বলে।
- ২৩। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে পার্থেনোকার্পি বলে।
- ২৪। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ভ্রূণথলির (ডিপ্লয়েড) ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অ্যাপোমস্পোরি বলা হয়।
- ২৫। ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে।
- ২৬। এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর দুটি (বা ততোধিক) উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ক্রস করানো প্রক্রিয়াকে বলা হয় হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরায়ন। সংকরায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্ভিদকে বলা হয় সংকর উদ্ভিদ।
- ২৭। IRRI-International Rice Research Institute (ফিলিপাইন-এ)
- ২৮। BRRI-Bangladesh Rice Research Institute (জয়দেবপুর, বাংলাদেশ)

অনুশীলনী

Must

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

- ১। নিষেকের পর ডিম্বাণু কিসে পরিণত হয়?
(ক) ভ্রূণ (খ) বীজ (গ) ফল (ঘ) সস্য
- ২। স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ থলিতে থাকে—
(i) ডিম্বাণুযুক্ত
(ii) প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস
(iii) ট্রিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস

উদ্ভিদ প্রজনন

৩৭৫

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উদ্ভিদপকের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



ফুলের লম্বচ্ছেদ

৩। উদ্ভিদপকের A চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হলো—

(i) পরাগ মাতৃকোষ ধারণ করে (ii) কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে (iii) পরাগরেণু তৈরি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৪। নিষেকের পর চিত্রের B অংশটি কিসে পরিণত হয়?

(ক) ফলে

(খ) বোঁটায়

(গ) সস্য

(ঘ) নষ্ট হয়ে যায়

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (ক)	২। (ক)	৩। (খ)	৪। (ক)
--------	--------	--------	--------

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

১। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) দ্বি-নিষেক কী?

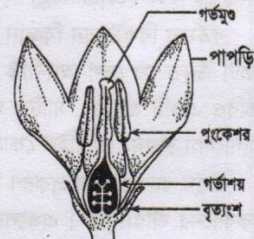
(খ) ইমাসুলেশন ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্ভিদপকের B চিত্রটি কীভাবে পুংগ্যামিট তৈরি করে?

(ঘ) চিত্র-B এর কী কী পরিবর্তনের মাধ্যমে চিত্র-A তৈরি হয় আলোচনা করো।



চিত্র -A



চিত্র -B

২। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) Chalazogamy কী?

(খ) দ্বি-নিষেক বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্ভিদপকে চিহ্নিত A সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করো।

(ঘ) A ব্যতীত উচ্চশ্রেণির জীবে জনুক্রম অসম্ভব—ব্যাখ্যা করো।



৩। পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) Porogamy কী?

(খ) একটি আদর্শ ডিম্বকের গঠন বর্ণনা দাও।

(গ) উদ্ভিদপকে বর্ণিত প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো।

(ঘ) উক্ত প্রক্রিয়া ব্যতীত আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌনজনন অসম্ভব—ব্যাখ্যা করো।

